Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৪ (পৃঃ ০৬)

গোল্ডেন রাইস কেন বারবার থমকে দাঁড়ায়

জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

আমাদের মতো দেশের অপুষ্টির শিকার বাচ্চা ও মায়েদের জন্য প্রযোজ্য একটি অনবদ্য আবিষ্কার গোল্ডেন রাইস; কিন্তু তথাকথিত পরিবেশবাদীদের বিরূপ প্রভাবে এখনও জাতে উঠতে পারলো না ধানের এই কৌলিক সারিটি। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ এবং ফিলিপিন্স একই সময়ে তাদের নিজ নিজ জনপ্রিয় ধানের জাতকে গোল্ডেন রাইসে রূপান্তরের কাজে নামে। প্রথমে বাংলাদেশ কিছুটা এগিয়ে থাকলেও এখন অনেকখানি পিছিয়ে গেছে। অন্যদিকে ফিলিপিন্সের সরকার ২০১৯ সালে মানুষ এবং পশুখাদ্যের জন্য কৌলিক সারিটিকে মেনে নেয়। বাণিজ্যিকভাবে আবাদের জন্য কৃষকের কাছে জাত হিসেবে পৌঁছে দেয় ২০২১ সালে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক নানা ধরনের দলিল-দস্তাবেজ জমা দিয়ে এখনও অপেক্ষায় আছে।

গত ৪ মার্চ ২০২৪ কৃষিমন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে ব্রি'র মহাপরিচালক ও ইরির কর্মকর্তাদের কথাবার্তা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফিলিপিন্সের জিএমও বিরোধী চাষিদের সংগঠন 'মাসিপাগ' এবং 'গ্রিনপিস সাউথইস্ট এশিয়া' গোল্ডেন রাইস আবাদ এবং বিটি-বেগুনের অনুমোদন সংক্রান্ত তাদের সরকারের আদেশ বাতিলের জন্য সে দেশের সুপ্রিম কোর্টে মামলা ঠুকে দেয়। অতঃপর মহামান্য কোর্ট স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর প্রভাব সংক্রান্ত বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব আছে মনে করে ১৭ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে সরকারের আদেশটি বাতিল করে দেয়। সাথে সাথে বাংলাদেশের কিছু পরিবেশবাদী সংগঠন যেমন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), উবিনীগ, জিএমও-বিরোধী মোর্চা, নয়া কৃষি আন্দোলন ও নাগরিক উদ্যোগ প্রমুখ সংগঠন ৬ মে ২০২৪ একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। সেখানে তারা তাদের মতো করে জিএমও প্রযুক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন কোনোক্রমেই যেন জিএমও-ফসলের অনুমোদন দেয়া না হয়।

উল্লেখ্য, জিএমও ফসল হিসেবে বিটি-বেগুন কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিটি-তুলো ইতোমধ্যে অনুমোদন পেয়ে গেছে। পরে উক্ত সংগঠনসমূহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব; বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বরাবরে গোল্ডেন রাইস সংক্রান্ত গবেষণার ইতি টানতে একটি চিঠি দিয়েছেন।

তাদের দাবি অনুযায়ী জিএম ফসল আবাদ করলে পরিবেশ ও গণস্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। তাছাড়া এ ধরনের ঝুঁকি নেই এমন যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য নাকি বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নেই। তারা আরও বলেছেন যে জিএম ফসলের কারণে অন্য ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ধানের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হবে এবং জিএমও প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত ফসলের স্বত্ব বিদেশী কোম্পানির কাছে চলে যাবে ইত্যাদি। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে তারা জিএমও সংক্রান্ত বিজ্ঞান বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেননি। তারা বলেছেন যে ভিটামিন-এর অভাবটা সাধারণ শাকপাতা-ফলমূল থেকেই তো মিটানো সম্ভব। হ্যাঁ, শাকপাতা-ফলমূল দিয়ে ভিটামিন-এর অভাব অবশ্যই পূরণ করা সম্ভব। তবে একজন অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে একজন প্রান্তীক মানুষের দৈনিক চাহিদার পুরোটা মিটানো সম্ভব নয়। তাই ঘাটতি ভিটামিন-এ এর অভাব পূরণের জন্য বিজ্ঞানীরা সেই ১৯৮২ থেকে ভিটামিন-এ রাইস উদ্ভাবন-সংক্রান্ত গবেষণা করে আসছে।

শুরুতেই এ গবেষণার আর্থিক জোগানদার ছিল রকফেলার ফাউন্ডেশন। আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটএবং আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার পিছনে এই ফাউন্ডেশন এক সময় মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল। যাই হোক এক সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীগণ গবেষণা শুরু করে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রফেসর ইঙ্গো পর্টিকাস এবং জার্মানির ফ্রেইবার্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাপলাইড বায়োসায়েন্সের প্রফেসর পিটার বেয়্যার। ১৯৯২ সালে গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন সংক্রান্ত একটি ওয়ার্কসপে এই দুই বিজ্ঞানী প্রথম মিলিত হন নিউইয়র্কে। অতঃপর তারা একসাথে কাজ শুরু করেন। তাদের যৌথ গবেষণার ফসল হলো ধানের মধ্যে বেটা ক্যারোটিন (যেটা ধানে নেই এবং ভিটামিনের আগের অবস্থা) প্রস্তুতের জৈব-রাসায়নিক পাথওয়ে প্রতিস্থাপন। এ জন্য বাইরের কোনো উৎস থেকে মাত্র দুটো জিন এনে সংস্থাপন করতে পারলেই হলো।

ইতোমধ্যে (১৯৯০ সালে) টমেটো গাছে একটি মাত্র ব্যাক্টেরিয়ার জিনকে কাজে লাগিয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পিটার ব্রামলে বেটা-ক্যারোটিন প্রস্তুতের প্রথম ধাপ (Phytoene থেকে Lycopene-এ উত্তরণ) উদ্ঘাটন করেন। পর্টিকাস এবং বেয়্যারের জন্য এই তত্ত্বই ছিল মূলমন্ত্র। তারা প্রথম দিকের গোল্ডেন রাইসের একটি জিন (psy: phytoene synthase) ড্যাফোডিল (Narcissus pseudonarcissus) থেকে আরেকটি জিন (crtl: phytoene desaturase) ব্যাক্টেরিয়া (উৎরিহরধ ঁৎবফড়াড়ৎধ) থেকে নেন। গোল্ডেন রাইসের প্রথম এই সংস্করণে (এজ১) উদ্ভূত ভিটামিন এ-এর পরিমাণ ছিল খুবই অল্প। পরবর্তিতে সিনজেন্টার অধীনে পরিচালিত গবেষণায় ড্যাফোডিলের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট জিনটি ভুট্টা থেকে ব্যবহার করে বেটা ক্যারোটিনের পরিমাণ প্রথমে উদ্ভাবিত কৌলিক সারির তুলনায় ২৩ গুণ বেশি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্বে উদ্ভাবিত গোল্ডেন রাইসকে এজ২ বলে অবিহিত করা হয়।

গোল্ডেন রাইসের বর্তমান প্রজন্ম বা কৌলিক সারিগুলো এজ২ থেকেই এসেছে। এ সংক্রান্ত তাদের গবেষণার বিস্তারিত ফলাফল প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। নিয়ন্ত্রীত পরিবেশে গোল্ডেন রাইসের প্রথম মাঠ-ট্রায়াল করা হয় ২০০৪ সালে লওউসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিগবেষণা কেন্দ্রে। এর পরে স্বত্বহীনভাবে গবেষণার পুরো-পদ্ধতি ও উদ্ভাবিত প্রথম দিকের বীজ তুলে দেয়া হয় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) হাতে। উদ্দেশ্যে ইরির তদারকিতে বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী গরিব দেশগুলো নিজ-নিজ দেশের জনপ্রিয় জাতগুলোতে যেন এই জিনগুলো প্রতিস্থাপন করে তাদের পছন্দ মতো ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ধানের জাত তৈরি করতে পারে।

এর আগে ইরি খাদ্য হিসেবে গোল্ডেন রাইস যে নিরাপদ তা প্রমাণের জন্য ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA), ফুড স্ট্যান্ডার্ডস অস্ট্রেলিয়া নিউ জিল্যান্ড (FSANZ), Health Canada এর কাছে তাদের চাহিদা মতো সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে। উক্ত সংস্থাগুলো কঠিন যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে গোল্ডেন রাইসকে নিরাপদ খাদ্য হিসাবে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করে। তাদের যাচাই-বাছাইকারী কমিটিতে সাধারণত মলিকিউলার বায়োলজিস্ট, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, টক্সিকোলজিস্ট, কেমিস্ট ও নিউট্রিশনিস্ট থাকেন। হেল্থ কানাডার বক্তব্য অনুযায়ী জিএমও প্রযুক্তির নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য বিশ বছর যাবৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), the ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অফ ইউনাইটেড নেশনস (FAO), এবং অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (OECD) প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী করা হয়। এবং সেটাই পৃথিবীর অনেক দেশে অনুসরণ করা হয়। এরপরেও কি ভিটামিন-এ রাইস নিয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে?

বাংলাদেশ এবং ফিলিপিন্সের বিজ্ঞানীরা ২০০৬ থেকে গবেষণা শুরু করে তারা নিজ নিজ দেশের উপযোগী ধানের কৌলিক সারি উদ্ভাবন করে। এজন্য আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় সব ধরনের বায়োসেফটি আইন মেনে বাংলাদেশের জন্য ব্রিতে প্রথম ২০১৫ সালে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ট্রায়াল শুরু হয়। এরপর প্রয়োজনীয় সমস্ত ট্রায়াল শেষ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। আমরা জানি গ্রিন পিচ বলে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সামগ্রিকভাবে জিএমও প্রযুক্তি এবং সুনির্দিষ্টভাবে গোল্ডেন রাইসের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। বাংলাদেশ এবং ফিলিপেন্সে যারা এ ব্যাপারে ভীষণ তৎপর তারা কোনো না ভাবে এই সংস্থার সাথে সম্পর্কিত; কিন্তু তাদের জানা উচিত যে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় সব জীববিজ্ঞানী, চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ, কৌলিতত্ত্ববিদ, কৃষিবিজ্ঞানী এবং শতাধিক নবেল লরিয়েট জিএম প্রযুক্তি এবং গোল্ডেন রাইসের পক্ষে কথা বলেছেন। ১৯৯৩ সালে শারীরবিজ্ঞান বা মেডিসিনে নোবেল বিজয়ী নিউ ইংল্যান্ড বায়োল্যাবের মলিকুলার বায়োলজিস্ট রিচার্ড জে রবার্টের নেতৃত্বে এই ক্যাম্পেন শুরু হয়।

তার ভাষায় "As scientists we understand the logic of science. Its easy to see that what Greenpeace is doing is damaging to the citizens of the developing world and is anti-science"। একই সাথে তিনি যে ভীষণ সত্যি কথাটি বলেছেন তা হলো- "Greenpeace initially, and then some of their allies, deliberately went out of their way to scare people about GMOs. It was a way for them to raise money for their cause"। আমাদের যারা পরিবেশবিদ গ্রিনপিচের সুরে গাইছেন তাদের বক্তব্যগুলো আবেগতাড়িত এবং অনেকটা রুটিন-ওয়াক্কের মতো। কিছু দিন পরপরই তারা এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তাই ভাববার বিষয় তারা কি সাধারণ মানুষের কথা ভেবে করছেন নাকি রিচার্ড রবার্টের ভাষায় নিজেদের কথাই ভাবছেন?

[**লেখক** : সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট; সাবেক নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন]

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ এবং ফিলিপিন্স একই সময়ে তাদের নিজ নিজ জনপ্রিয় ধানের জাতকে গোল্ডেন রাইসে রূপান্তরের কাজে নামে। প্রথমে বাংলাদেশ কিছুটা এগিয়ে থাকলেও এখন অনেকখানি পিছিয়ে গেছে। অন্যদিকে ফিলিপিন্সের সরকার ২০১৯ সালে মানুষ এবং পশুখাদ্যের জন্য কৌলিক সারিটিকে মেনে নেয়। বাণিজ্যিকভাবে আবাদের জন্য কৃষকের কাছে জাত হিসেবে পৌঁছে দেয় ২০২১ সালে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক নানা ধরনের দলিল-দস্তাবেজ জমা দিয়ে এখনও অপেক্ষায় আছে

দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৪ (পৃঃ ০৮)

পার্বতীপুরে বাসমতি ধান

■ সোহেল সানী

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাসমতি চালের চাহিদা রয়েছে। বিরিয়ানি, পোলাও এবং সাদা ভাতে এ চাল সমাদৃত। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের দিনাজপুর আঞ্চলিক কার্যালয় উপজেলার মন্মথপুর ইউনিয়নের রাজাবাসর গ্রামের কৃষক অমিত চন্দ্র রায়ের জমিতে উৎপাদিত হয়েছে বাসমতি ধান। বাসমতি (ব্রি-ধান ১০৪) মাড়াই ও পরিমাপ করে ফসল কর্তন উৎসব ও মাঠ দিবস ২৯ মে ৫টায় উদ্‌যাপন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের দিনাজপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মো. রকিবুল হাসান। তিনি বলেন, একটি নতুন জাতের ব্রি-ধান ১০৪ ধান। এটি ভারত-পাকিস্তানের বাসমতি চালের মতো লম্বা দানা ও সুগন্ধিযুক্ত। প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৯ ভাগ এবং ভাত ঝরঝরে। ব্রি-ধান ১০৪-এর বাসমতি চাল আমাদের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করবে। কৃষক অমিত চন্দ্র রায় বলেন, ১শ' শতাংশ জমিতে এ ধানের আবাদ করে হেক্টরপ্রতি প্রায় ৯০ মণ ধান ফলন পেয়েছি। এ ধান আবাদে আমার লাভ হয়েছে। আগামী ইরি-বোরো মৌসুমে আরও বেশি করে চাষাবাদ করব। মন্মথপুর ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. ফারুক হোসেন বলেন, নতুন জাতের (ব্রি-ধান ১০৪) ধানের ফলন দেখে আশপাশের অনেক কৃষক এ ধানের আবাদে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে আগামী বছর অনেক কৃষক এ ধানের আবাদ করবেন। পার্বতীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. রাজিব হাসান বলেন, এ ধানের চাল বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে। ব্রি-ধান ১০৪-এ আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ ধান কৃষকের আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করবে। তাই আমরা এ ধানের আবাদ সম্প্রসারণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া ব্রি-ধান ১০৪-এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত ধান চাষাবাদের চেয়ে খরচ অনেক কম হয়।